গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৪ সংখ্যা | ২২ - ২৮ আগস্ট ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান এঙ্গেলস স্মরণে

সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের স্মরণদিবস উপলক্ষে ১২ আগস্ট দলের শিবপুর সেন্টারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

হিমালয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পিছনে মুনাফা লালসাই

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

হিমালয় সন্নিহিত তিনটি রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ এবং এগুলিকে মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় বলে অভিহিত করে এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ আগস্ট বলেন,

আমরা গভীরভাবে মর্মাহত যে, মেঘভাঙা বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের

দুয়ের পাতায় দেখুন

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করতেই এখনও ভর্তি শুরু হল না কলেজে

প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ

রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকের ফল ঘোষিত হওয়ার পর তিন মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে অথচ এখনও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলিতে ভর্তি শুরুই হয়নি। বেশির ভাগ বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্য রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ইতিমধ্যে ভর্তি শেষ হয়ে প্রথম সেমেস্টারের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে স্নাতকে আবেদন করা ছাত্র-ছাত্রীদের মেরিট লিস্ট প্রকাশ করে কলেজে ভর্তি শুরু এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল দ্রুত প্রকাশ করার দাবিতে ১৪ আগস্ট কলকাতা ও শিলিগুড়িতে পথ অবরোধ এবং রাজ্যের সমস্ত জেলায় বিক্ষোভ দেখায় এবং অবস্থান করে এআইডিএসও।

১৪ আগস্ট কলকাতার কলেজ স্ট্রিট মোড়ে পথ অবরোধ চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে। এ দিন শিলিগুড়িতেও পথ অবরোধ হয় এবং রাজ্যের সমস্ত জেলায় বিক্ষোভ এবং অবস্থান করে এআইডিএসও

কলকাতার কলেজ স্ট্রিট মোড়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন— উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের ১০০ দিনের বেশি অতিক্রান্ত। এখনও স্নাতকে ভর্তির মেরিট লিস্টপ্রকাশ করতে পারল না রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর। কেন মেরিট লিস্ট প্রকাশ হচ্ছে না, তার যথাযথ উত্তরও উচ্চশিক্ষা দপ্তর বা শিক্ষামন্ত্রী দেননি। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে বেসরকারি ও অটোনমাস কলেজগুলিকে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লোটার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই সরকারি কলেজগুলোতে ভর্তি বন্ধ রেখেছে। সরকার চাইলে ওবিসি সংরক্ষিত ৭ শতাংশ আসন ফাঁকা রেখে কলেজগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে ক্লাস শুরু করে

আটের পাতায় দেখুন

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা মানবমুক্তির দিশারি

৫ আগস্টের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক, এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৫০তম স্মরণ দিবস ৫ আগস্ট কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের সভায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্যটি সম্পাদিত আকারে প্রকাশ করা হল।

কমরেড সভাপতি, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

আজ গোটা ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে প্রতি বছরই আমরা এই দিনটি উদযাপন করি। প্রয়াত নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড হীরেন সরকার, পরবর্তীকালের নেতৃবৃন্দ কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী, কমরেড তাপস দত্ত, কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত, কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত, কমরেড অনিল সেন, কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড মানিক মুখার্জী, বাংলাদেশে যিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় নতুন দল গড়ে তুলেছেন— সেই কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী— প্রত্যেকেই এই দিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন, মহান নেতার শিক্ষা স্মরণ করেছেন। মৃত্যুর আগে তাঁরা সকলেই ভেবেছেন, মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিজেদের জীবনে তাঁরা কতখানি কার্যকর করতে পেরেছেন। আমাদের দলের যে কর্মীরা প্রয়াত হয়েছেন, জীবনের শেষ সময়ে এই প্রশ্নটিই তাঁদের বিবেককে ধাক্কা দিয়েছে। আমাদের প্রায় দু'শো জন নেতা-কর্মী, কংগ্রেস-সিপিএম-তৃণমূল শাসনে পরপর যাঁদের খুন করা হয়েছে, তাঁদের শর্ত দেওয়া হয়েছিল— হয় এই দল ত্যাগ করো, না হলে মরতে হবে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তাঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ত্যাগ করেননি।

কী সেই শিক্ষা, কী সেই শক্তি যার জোরে তাঁরা এই মানসিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন, এই লড়াই লড়তে পেরেছেন? তা হচ্ছে বৈপ্লবিক আদর্শ, উন্নত নৈতিকতা, শোষিত জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসা, মমত্ববোধ। আর তিনি শিখিয়েছেন, যথার্থ মনুষ্যত্ব কাকে বলে, যথার্থ মর্যাদাবোধ কাকে বলে, কী ভাবে উন্নত নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হয়।

আপনারা জানেন, কিছু কিছু শোক, ব্যথা-বেদনা থাকে যেগুলো সময়ের গতিপথে কালের নিয়মে থিতিয়ে যায়, মিলিয়ে যায়। আর কিছু কিছু শোক-ব্যথা থাকে বাইরে যার প্রকাশ দৃশ্যত না থাকলেও চেতনা যত উন্নত হতে থাকে, অন্তরের অন্তঃস্থলে সে বেদনা ততই গভীরতর হয়, কর্তব্যবোধ ও বিবেককে আরও জাগিয়ে তোলে।

মার্ক্সবাদী বিপ্লবী আদর্শকে আরও উন্নত করেছেন শিবদাস ঘোষ

আমার নিজের কথা বলি। তেরো বছর বয়সে আমি এই দলে যুক্ত হই। তখন আমি ক্লাস এইটের ছাত্র। সেই সময়ে সমাজ-

দুয়ের পাতায় দেখুন

এখন রাজনৈতিক নেতারাই ধর্মপ্রচারক হয়ে উঠছেন

একের পাতার পর

পরিবেশের প্রভাবেই কমিউনিজমের প্রতি আকর্ষণ ছিল। মহান স্ট্যালিন, মহান নেতাজির নাম আমাদের উজ্জীবিত করত। একটা আকস্মিক ঘটনায় আমি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে আসি। তখন খুব একটা বোঝার বয়স আমার ছিল না। কিন্তু দেখেছি, সেই সময় দলের কর্মীসভা মানেই ৪০-৫০ জন। পাবলিক মিটিং মানেই হাজরা পার্কে ১৫০-২০০ জন। আমাদের শুনতে হত— এসইউসি পার্টি নয়, ওটা একটা ক্লাব, ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, চামচিকেও পাখি এসইউসি-ও পার্টি! আমাদের শুনতে হয়েছে মহান স্ট্যালিন, মহান মাও সে তুং সিপিআই-কে সমর্থন করছেন, শিবদাস ঘোষ কি তাঁদের চেয়েও বড়? শিবদাস ঘোষ একদিকে বলেন, তিনি স্ট্যালিন-মাও সে তুংকে নেতা হিসেবে মানেন। তা হলে কেন বলছেন সিপিআই যথার্থ মার্ক্সবাদী দল নয়? এই সব নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি দিনের পর দিন কমরেড শিবদাস ঘোষ অনাহারে অর্ধাহারে কাটিয়েছেন। আমি দেখেছি, কোনও দিন ভাত জুটলে হয়তো একটু তেল-নুন মেখে খাচ্ছেন, হয়তো একটু ডালের জল ছিল, তা দিয়েই খাচ্ছেন। আবার কোনও দিন হয়তো মুড়ি খাচ্ছেন। কোনও দিন হয়তো তা-ও জুটত না। এ সব আমি নিজে দেখেছি। আমি এবং আমার সময়ে যাঁরা ছিলেন, সকলেই কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করতাম। আমরা বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-দেশবন্ধু-নেতাজি-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র— এইসব বড় মানুষের কথা শুনেছি, এঁদের দেখিনি। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষকে দেখেছি— একজন যথার্থই বড় মানুষ। তাঁর প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ বোধ করতাম, তাঁর বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম, তাঁর আচার-আচরণ, চলাফেরা— সব কিছুর মধ্যেই জীবন্ত মনুষ্যত্ব ফুটে উঠত। এই আকর্ষণ সব দিনই অনুভব করেছি। দিবারাত্র তিনি আমাদের পিছনে পরিশ্রম করেছেন। আজ আমার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণ আপনারা দেখে থাকেন, সেটা তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। কমরেড শিবদাস ঘোষের নিবিড় সংস্পর্শে ২৬ বছর কাটিয়েছি। তাঁর স্নেহে লালিত পালিত হয়েছি। তাঁর কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছি, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমি আজও তা বহন করে যাচ্ছি।

সে দিন আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত যে সব দল, সেই সিপিআই আজ খণ্ড-বিখণ্ড, ক্ষমতাচ্যুত, সিপিএম হীনবল, নকশালরা নানা গ্রুপে বিভক্ত। আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক বিলুপ্তপ্রায়, আরসিপিআই অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এরা সে দিন বড় পার্টি ছিল। কীসের শক্তিতে আমাদের দল বেড়ে চলেছে, ভারতের রাজ্যে রাজ্যে প্রসারিত হয়ে চলেছে? কোনও সংবাদমাধ্যম কমরেড শিবদাস ঘোষের নাম উচ্চারণ করেনি। কোনও প্রচার-যন্ত্রে তাঁর নাম ছিল না। কোনও এমএলএ-এমপি, কোনও মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় এ দলের প্রসার হয়নি। কিন্তু এ দলের শক্তি অমোঘ। এই শক্তি হল সেই মহান মার্ক্সবাদী বিপ্লবী আদর্শ যা কমরেড শিবদাস ঘোষ গ্রহণ করে তাকে আরও উন্নত করেছেন।

ধর্মের যথার্থ ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়েছে মার্ক্সবাদ

কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মীয় চিন্তা, বিবেকানন্দের চিন্তা, গান্ধীজির চিন্তা থাকতে কমরেড শিবদাস ঘোষ কেন মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করলেন? এই সব আদর্শ যদি জনগণের সমস্যার সমাধানের পথ দেখাতে পারত তা হলে নিশ্চয়ই তিনি সেই আদর্শকেই গ্রহণ করতেন। এক সময় ধর্মের ভূমিকা যথার্থই গৌরবময় ছিল, প্রগতিশীল ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচার হয়— আমরা মার্ক্সবাদী, আমরা কমিউনিস্ট, আমরা ধর্মে বিশ্বাস করি না। আর যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না তাদের দ্বারা মানুষের কল্যাণ হবে কী করে? এ কথা ঠিক যে আমরা মনে করি, আজকের দিনের সমস্যাগুলির সমাধান ধর্মীয় পথে হতে পারে না। আবার এ কথাও আমরা মনে করি, এই ধর্মই একদিন মানুষকে পথ দেখিয়েছিল। ধর্ম এসেছিল দাস প্রথার যুগে। মহান মার্ক্স বলেছিলেন, নিপীড়িত মানুষের চোখের জল, অত্যাচারিত মানুষের দুঃখ-বেদনাই ধর্মের, ঈশ্বর-বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। তিনি বলেছেন, ধর্মীয় প্রতিবাদ শোষিত মানুষের প্রতিবাদ। বলেছেন, হৃদয়হীন পৃথিবীতে ধর্মই প্রথম হৃদয়বৃত্তি এনেছে। এই ছিল মার্ক্সের ঐতিহাসিক উক্তি। যাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করেন, হয় তাঁরা মার্ক্সের এই উক্তি জানেন না, না হয় জেনেও ভুলিয়ে দিতে চান। মার্ক্সের ছাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ধর্মই মানবসমাজে ন্যায়-নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ, পাপ-পুণ্যের বোধ প্রথম এনেছিল। এই হল ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সবাদের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন। পরবর্তী কালে রাজতন্ত্র যখন শোষণের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করছিল এবং এর পর বণিকী-পুঁজি যখন শিল্প-পুঁজির স্তরে উন্নীত হচ্ছে, যখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শিল্প-পুঁজি লড়ছে, রাজতন্ত্র তখন দাঁড়িয়েছিল ধর্মীয় চিন্তার উপর ভিত্তি করে। বলা হত, রাজা ভগবানের প্রতিনিধি। রাজার বিরুদ্ধে যাওয়া মানে ভগবানের বিরুদ্ধে যাওয়া। ফলে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভলতেয়ার, বেকন, স্পিনোজা, হবস, বেন্থাম, কান্ট, হিউম, দেকার্তে, ফুয়েরবাখ প্রমুখ ছিলেন সেই যুগের বুর্জোয়া দার্শনিক-চিন্তাবিদ। তাঁরা বলেছিলেন, ধর্ম হল অ্যাবারেশন অফ হিস্ট্রি— ইতিহাসের বিচ্যুতি। তাঁরা অশ্রদ্ধার চোখে ধর্মকে দেখেছিলেন। বেকন এমনও বলেছিলেন, বাইবেল পুড়িয়ে ফেল।

এখন রাজনৈতিক নেতারাই ধর্মপ্রচারক হয়ে উঠছেন

মার্ক্সবাদ কিন্তু কখনওই ধর্মকে এ ভাবে দেখেনি। বরং ধর্মীয় চিন্তার অভ্যুত্থানের যুগে তার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে শ্রদ্ধাই করেছেন। কিন্তু এ কথাও সত্য, আজকের দিনের কোনও সমস্যা নিয়ে ধর্মীয় শাস্ত্রে আলোচনা নেই। আজ বেকার সমস্যা বাড়ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, ট্যাক্স রেট বাড়ছে ক্রমাগত, ব্যাপক সংখ্যায় নারী ধর্ষণ ঘটছে, দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছে, যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, যাদের দুর্নীতি দমন করার কথা, তারাই সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত— গীতা, বেদ-বেদান্ত, রামায়ণ, কোরান, বাইবেল, কোথাও কি এই সব সমস্যা নিয়ে কোনও আলোচনা আছে? সমাধানের কোনও পথ কি আছে? কোথাও নেই। কারণ যে যুগে এ সব ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, সেই যুগে এই সব সমস্যা আসেনি। ধর্মপ্রচারকরা সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যে যে সমস্যা দেখেছেন, নিজেদের চিন্তা অনুযায়ী সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। সেই যুগে যাঁরা ধর্মপ্রচারক ছিলেন, তাঁরা সেই সময় সমাজের যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন। গৌতম বুদ্ধ— যদিও তিনি ভগবান মানতেন না, জৈন ধর্মের উদগাতা মহাবীর— তিনিও ভগবান মানতেন না— তাঁরা কী ভাবে লড়েছেন? সেই সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন শঙ্করাচার্য, যিশুখ্রিস্ট প্রাণ দিয়েছেন, হজরত মহম্মদ জীবন বিপন্ন করে লড়েছেন। আজকের যুগে কি কোনও ধর্মপ্রচারককে দেখা যায় একটিও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে? এত যে অত্যাচার, নারী নির্যাতন-নারী ধর্ষণ হচ্ছে— কোনও ধর্মপ্রচারক, কোনও মন্দির-মসজিদ-গির্জা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে? তারা শুধু প্রার্থনা করছে। আমি যুক্তির খাতিরে বলছি, আজ যদি বুদ্ধদেব, মহাবীর, যিশুখ্রিস্ট, হজরত মহম্মদের মতো যথার্থ ধর্মপ্রচারকরা বেঁচে থাকতেন, তাঁরা কি কোনও অন্যায় দেখলে বলতেন, এখন প্রতিবাদ কোর না, এখন মন্দিরে পূজার সময়, এখন গির্জায় প্রার্থনার সময়, মসজিদে নমাজ পড়ার সময়? নিশ্চয়ই বলতেন না। বরং তাঁরা এ সবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। তাঁরা ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। আমরা মার্ক্সবাদীরা তাঁদের এ ভাবেই মর্যাদা দিই। মার্ক্স থেকে শিবদাস ঘোষ— এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের এই মর্যাদা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এ কথা ঠিক, আজ ধর্ম কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বরং ধর্মীয় মতে এ কথাই প্রচার করা হয় যে, সব কিছুই ভগবানের সৃষ্টি, ধনী-গরিবও ভগবানের সৃষ্টি। গরিব কেন গরিব, কেন তারা না খেয়ে মরছে, কেন তাদের কোলের সন্তান বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে— এ সবই হল কর্মফল, তাদের পূর্বজন্মের পাপের ফল। আর এই আম্বানি, আদানি, টাটা, যারা গরিবের রক্ত শোষণ করে কোটি কোটি টাকা লুঠ করছে— এরা সব পূর্বজন্মে পুণ্য করেছে। ভগবান তাই এই ভাবে ভোগ করার জন্য তাদের পাঠিয়েছে। ধর্মীয় প্রচারে এমনই বলা হয়।

সেই সময় ধর্মপ্রচারকরা না খেয়ে থাকতেন, আর আজ এক-একটা মন্দির মসজিদ গির্জা বিপুল সম্পদের মালিক। এই সব জোগান দেয় মালিক পুঁজিপতিরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা। আর এই টাকা দেয় বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। তাঁরা মন্দির গড়েন, নানা পূজার ব্যবস্থা করেন। এই যে এত পূজার আয়োজন, এত ধর্মপ্রচারের হিড়িক— এ তো এদেরই সৌজন্যে! এখন তো এরাই সব ধর্মপ্রচারক হয়ে গেছেন। বিজেপির নেতারা সব এক-একজন ধর্মপ্রচারক। বিভিন্ন রাজ্যের নেতাদের মধ্যে কে কতখানি ধর্ম মানেন তার প্রতিযোগিতা চলছে। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একজন ধর্মপ্রচারক। এ সবের পিছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে— মানুষকে ধর্মান্ধ করে রাখো যাতে তারা প্রশ্ন না করে। সমস্ত অত্যাচার-শোষণ কপালের, অদৃষ্টের লেখা, পূর্বজন্মের কর্মফল, বিধাতার বিধান— এই ভাবে তারা যাতে মেনে নেয়। তা হলে তারা প্রতিবাদ করবে না, লড়াই করবে না। এ জন্যই রামমন্দির, এ জন্যই সম্প্রতি দিঘাতে কয়েক কোটি সরকারি টাকা খরচ করে তৈরি হল জগন্নাথের মন্দির। বিজেপি রাম মন্দির করছে, তৃণমূল এ রাজ্যে জগন্নাথ মন্দির করছে। এগুলি আসলে সবই ভোটের মন্দির— ভোট পাওয়ার জন্য আর সাধারণ মানুষকে আরও ধর্মান্ধ করে তোলার জন্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকায় ধর্মান্ধতা বাড়ছে। অভাব-দুঃখ যত বাড়ছে, ধর্মান্ধতা তত বাড়ছে। এই জন্মে কোনও সুখ-শান্তি নেই, পরজন্মে যদি পাই! এই জন্য কুম্ভ মেলায় লাখ লাখ মানুষ ছোটে, সেখানে পদপিষ্ট হয়ে মারা যায়। অভাবী মানুষ এই মন্দিরে ছোটে, ওই মন্দিরে ছোটে। এখানে এক বাবাজি,

তিনের পাতায় দেখুন

হিমালয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়

একের পাতার পর

তিনটি রাজ্য হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং কাশ্মীরের অনেক জায়গা ধ্বংস হয়েছে, শতাধিক মূল্যবান জীবন চলে গেছে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে এবং সড়ক ও ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। যদিও সরকারি সংস্থাগুলি অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগকে এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছে, বাস্তবে বাস্তুতন্ত্রকে বিঘ্নিত না করা এবং ভূমিকম্পের কারণগুলিকে বাড়তে না দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা বারবার উপেক্ষা করা হয়েছে।

এই রাজ্যগুলিতে বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থার মুনাফার স্বার্থে পর্যটন ও ধর্মীয় পর্যটনের পরিকাঠামোর নামে যথেচ্ছ নির্মাণ চলছে। সরকারের টোল ট্যাক্স আদায় বাড়ানোও এর অন্যতম লক্ষ্য। শত শত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, যথেচ্ছ বাঁধ ও হোটেল নির্মাণ, রাস্তা চওড়া করা এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা বেপরোয়া অরণ্য ধ্বংসের মতো তথাকথিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই সমস্ত যথেচ্ছাচারই এই জাতীয় বিপর্যয়ের মুখ্য কারণ। পাশাপাশি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের বেপরোয়া নির্গমন, গাড়ির ধোঁয়া থেকে লাগামহীন দূষণ, কারখানাগুলিতে দূষণ-প্রতিরোধী নিয়ম লঙ্ঘন করে বিষাক্ত বর্জ্য পরিবেশে জমা করা ইত্যাদি কারণই তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, তীব্র বৃষ্টিপাত, হিমবাহের গলন, পাহাড়ি কাঠামোতে ফাটল এবং ঘন ঘন ও শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় সহ প্রাণঘাতী বজ্রপাতের মতো চরম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। তাই এগুলি প্রকৃতির অস্বাভাবিকতা নয়, বরং মনুষ্য-সৃষ্ট বিপর্যয়।

বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং যথাযথ পুনর্বাসনের দাবি জানাচ্ছি আমরা। আমরা মনে করি, কেবল শক্তিশালী গণআন্দোলনই পারে বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ ও দুর্যোগের এই পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তি রোধ করতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ায় সরকারকে বাধ্য করতে।

এ দেশের তথাকথিত কমিউনিস্টরা মার্ক্সবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেনি

দুয়ের পাতার পর

সেখানে আর এক বাবাজির পদধূলি পাওয়ার জন্য ছোটে। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গেই মার্ক্স আর একটা উক্তি করেছিলেন, ধর্মকে আফিংয়ের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝেছিলেন, ধর্মীয় পথে আজকের দিনের মানুষের সমস্যার সমাধান নেই।

বিবেকানন্দ গান্ধীজির পথে শোষণমুক্তি হবে না

কমরেড শিবদাস ঘোষ বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করতেন। বিবেকানন্দের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা, স্বাধীনতাবোধ— এই গুণগুলিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। আবার তিনি বুঝেছিলেন, বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা আছে। সেই চিন্তার মধ্যেও সমস্যা সমাধানের পথ নেই। এক বিবেকানন্দ বলেছেন, লক্ষ লক্ষ গরিব নিপীড়িত মানুষের বুকের রক্ত শোষণ করে শিক্ষার্জন করে যারা তাদের দিকে ফিরে তাকানোর অবসর পায় না, আমি তাদের বিশ্বাসঘাতক বলি। বলেছিলেন, কোটি কোটি মানুষ যেখানে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছে, সেখানে তাদের অর্থে নিশ্চিন্ত হয়ে যারা তাদের দিকে লক্ষ করে না, আমি তাদের দেশদ্রোহী বলি। আরও বলেছেন, আগে রুটি চাই, তারপরে ভগবান। বলেছেন, কাশী-মথুরায় মন্দির গড়ছে, মূর্তি গড়ছে, তাকে কাপড় পরাচ্ছে, গয়না পরাচ্ছে, আর আসল ঠাকুর অন্ন বিনা, বস্ত্র বিনা মরছে। এই হলেন এক বিবেকানন্দ, যিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ-ব্যথা-বেদনায় অশান্ত, অস্থির হয়ে ছটফট করছেন। আবার অন্য আর এক বিবেকানন্দ বেদান্ত-দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, যত পা হাঁটছে, যত হাত কাজ করছে সবই আমার পা, আমার হাত। রাজপ্রাসাদে যে ভোগ করছে, সে আমি। আবার রাস্তায় যে ভিখারি দুঃখের মধ্যে ভিক্ষা করছে, তার মধ্যেও আমি। অশিক্ষিতের মধ্যেও আমি, শিক্ষিতের মধ্যেও আমি। সবলের মধ্যেও আমি, দুর্বলের মধ্যেও আমি। আমি অনাহারে থাকলেও লক্ষ লক্ষ মুখ দিয়ে এই আমিই খাদ্য গ্রহণ করছি। ফলে আমি যখন খেতে পাই না, তখন আমি তা নিয়ে ভাবি না। বলছেন, এটাই বৈদান্তিক নৈতিকতা। লাহোরে বেদান্ত নিয়ে এক আলোচনায় তিনি এই সব কথা বলেছেন। এই বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন ব্রহ্মই সত্য, সবার মধ্যেই ব্রহ্ম আছে। ফলে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত যা আমরা দেখছি সবই মায়া। এটাই হল বেদান্তের ব্যাখ্যা। বিবেকানন্দ যখন দর্শনে ঢুকছেন তখন তিনি অন্য আর এক বিবেকানন্দ। এক বিবেকানন্দ আর এক বিবেকানন্দের চিন্তার বিরোধিতা করছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝেছিলেন, এই পথে কোনও সমাধান নেই।

আর গান্ধীজি তো ঘোষণাই করেছিলেন, আমি যা কিছু বলছি সব কিছুই ঈশ্বরের বাণী। বলেছেন, আমার মধ্যে যখন কোনও চিন্তা আসে, প্রশ্ন আসে, আমি মাঝরাতে ভাবতে থাকি। হঠাৎ আমার মধ্যে একটা অনুভূতি হয়, ঝড় ওঠে মনের মধ্যে। আমি বুঝতে পারি ঈশ্বরের বাণী আসছে। তখন আমি লিখতে থাকি। তিনি বলেছেন, গোটা বিশ্বও যদি আমাকে অবিশ্বাস করে, তা হলেও আমি বলব আমি ঈশ্বরের বাণী পেয়েছি। তিনি বলেছেন, আমাকে যদি গ্যারান্টি দেওয়া হয় যে, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আসবে, তা হলেও আমি সেই স্বাধীনতা চাই না। এই হলেন গান্ধীজি। তিনি বলেছেন, ভগবান ধনীদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই গরিবদেরও সৃষ্টি করেছেন। ধনীরা হচ্ছে বুদ্ধির শক্তি, আর গরিবরা হচ্ছে শ্রমের শক্তি। তিনি বলেছেন, পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করলে সমাজে বুদ্ধি থাকবে না। তা হলে সমাজ চলবে কী করে? সুতরাং পুঁজিপতিরাও থাকবে, শ্রমিকরাও থাকবে। পুঁজিপতিদের বলেছেন, তোমাদের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন অনুযায়ী যা নেওয়ার নেবে, আর বাকিটা সাধারণ মানুষকে দেবে। এই হল গান্ধীজির কথা। এখন আপনারাই বলুন, কোনও পুঁজিপতি বলে যে, ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন ছাড়া সে নেয়? গান্ধীজি বলেছেন, পুঁজিবাদ থাকবে, কিন্তু আমি পুঁজিপতিদের মন এমন ভাবে পাল্টে দেব যাতে তারা সাধারণ মানুষের কথা ভাবে। এই গান্ধীবাদের ফল তো দেখতেই পাচ্ছেন, কী ভাবে পুঁজিপতিরা দেশের মানুষকে শোষণ-পীড়ন করছে! কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝেছিলেন, গান্ধীবাদের পথেও ভারতবর্ষের শোষণমুক্তি হবে না।

মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই শিবদাস ঘোষের সংগ্রাম

তিনি বুঝেছিলেন, শোষণমুক্তি ঘটাতে পারে একমাত্র মার্ক্সবাদ। কারণ মার্ক্সবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। কোনও বিশেষ ব্যক্তি বলছে, কোনও বড় মানুষ বলছে, কোনও পবিত্র গ্রন্থে লেখা আছে বলেই তা সত্য নয়। বিভিন্ন বড় মানুষ, বিভিন্ন গ্রন্থ পরস্পরবিরোধী কথা বলেছে, কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক তা ঠিক হবে কী করে?

বুকস্টল। ৫ আগস্ট

সকলের গ্রহণযোগ্য সত্য নির্ধারিত হবে কী করে? এটা একমাত্র হতে পারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রমাণের ভিত্তিতে। মার্ক্সবাদই একমাত্র দর্শন যে এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও প্রমাণকেই সত্য নির্ধারণের পথ হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই যে এখানে মাইক চলছে, এটা পরীক্ষিত প্রমাণিত একটা যন্ত্র, এই যে বিদ্যুতের আলো— এটাও পরীক্ষিত প্রমাণিত যান্ত্রিক ব্যবস্থা। যা কিছু যানবাহন চলছে, সবই পরীক্ষিত প্রমাণিত। এই যে নির্মাণ শিল্প চলছে, কল-কারখানা চলছে, এ সবই পরীক্ষিত প্রমাণিত। কী ভাবে কৃষিকাজ চলবে তা-ও পরীক্ষিত প্রমাণিত, মানুষ মহাকাশে যাচ্ছে, এটাও পরীক্ষিত প্রমাণিত। এ নিয়ে দেশে দেশে কোনও বিরোধ নেই। এ হল বিজ্ঞান, যা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সত্য, আমেরিকার ক্ষেত্রেও সত্য, ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রেও সত্য, সব দেশেই সত্য। ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ এক রকম, আমেরিকায় আর এক রকম— এ হয় না। জল হল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফল। জাপান বলবে, না এটা নাইট্রোজেন এবং কার্বনের সংমিশ্রণের ফল— এমন হয় না। কারণ, এগুলি সব পরীক্ষিত সত্য। মার্ক্সবাদই একমাত্র দর্শন, যে দর্শন পরীক্ষিত সত্য হিসেবে এসেছে, প্রমাণিত সত্য হিসেবে এসেছে। মার্ক্সবাদ এসেছে পুরনো যত বড় মানুষের চিন্তা, তার ধারাবাহিক পথে, আবার তার সাথে ছেদ ঘটিয়ে। যখন পুঁজিবাদ এসেছে, পুঁজিবাদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির সংঘাত শুরু হয়েছে এবং ডারউইনের আবিষ্কার, মর্গানের আবিষ্কার, আধুনিক বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার— এগুলিকে ভিত্তি করেই মহান দার্শনিক কার্ল মার্ক্স তাঁর দর্শনকে মানবজাতির সামনে উপস্থিত করেছেন। মার্ক্সবাদ মার্ক্সের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। যেমন অ্যাটম সম্পর্কে ধারণা কারও মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, ইলেকট্রন সম্পর্কে ধারণা কারও মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে ধারণা মস্তিষ্কপ্রসূত নয়— এ সবই পরীক্ষিত প্রমাণিত। মার্ক্স আসার আগেও যে নিয়মে জগত চলছিল, সমাজ চলছিল, মার্ক্স সেই নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছেন। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বটানি, জিওলজি, জিওগ্রাফি ইত্যাদি বিজ্ঞানের যে নানা শাখা প্রকৃতি জগতের, বিজ্ঞান জগতের নানা ক্ষেত্রে কাজ করছে, সেগুলির বিশেষ নিয়মগুলিকে কো-অর্ডিনেট করে, কো-রিলেট করে তা থেকে মার্ক্স সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, যেগুলি সকল বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। এটাই হল তাঁর কৃতিত্ব। এই সাধারণ নিয়মটিই হল মার্ক্সবাদ। তারই ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতি জগত এই নিয়মেই পরিবর্তিত হচ্ছে। এই যে বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা হবে কি না, ইত্যাদি যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়, এগুলো সবই তো বিজ্ঞান প্রয়োগ করে ঘোষিত হচ্ছে। তিনি দেখালেন, তেমনই সমাজও পরিবর্তিত হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী। আদিম সমাজ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ এগুলো একটার পর একটা যে এসেছে, সেগুলি নিয়মবহির্ভূত আকস্মিক ঘটনা নয়, তারও কতকগুলি নিয়ম আছে। কী সেই নিয়ম— সেটা আবিষ্কার করেছেন মার্ক্স। আবিষ্কার করে বলেছেন, আজকের এই পুঁজিবাদও চিরস্থায়ী নয়। প্রকৃতি জগতে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই, বস্তু জগতে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই, সমাজ জীবনেও চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই। সব কিছুই পরিবর্তনশীল, গতিশীল। অপরিবর্তনীয় সত্য, শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই। থিওরি অফ রিলেটিভিটি অনুযায়ী সত্য নিরন্তর গতিশীল। সত্য আপেক্ষিক কিন্তু কংক্রিট। বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ সত্য। এই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই শ্রমিক বিপ্লবের প্রশ্ন এসেছে। মার্ক্স বলেছেন, একদিন পুঁজিবাদও থাকবে না। এর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লব করবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। আবার সমাজতন্ত্রও চিরকাল থাকবে না। এরপর আসবে কমিউনিজম। কমিউনিজমও এক স্তরে থাকবে না। আরও নতুন নতুন উন্নত সমাজ আসবে। সমাজ ক্রমাগত এগোতেই থাকবে। এই হচ্ছে মার্ক্সবাদ। এই মার্ক্সবাদ একটি বিজ্ঞানসম্মত দর্শন। এই দর্শনকে ভিত্তি করেই কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রাম এবং সাধনা।

মার্ক্সবাদী বলে কথিত নেতাদের দ্বিচারিতা কমরেড শিবদাস ঘোষকে ধাক্কা দেয়

কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৩ বছর বয়সে স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী ধারায় যুক্ত হয়েছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত থাকাকালীন কয়েক বছরের মধ্যে তিনি মার্ক্সবাদী চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে জেলে থাকাকালীন মার্ক্সবাদ নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। সেই আলাপ-আলোচনার মধ্যে তিনিও ছিলেন। সেই সময় তাঁর মনে ধাক্কা দেয় যে, জেলে যাঁরা মার্ক্সবাদ বোঝাচ্ছেন, ভগবান নেই বলছেন, তাঁদের অনেকেই আবার পৈতে নেন, পুজো করেন। তিনি এমন তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতাকেও দেখেছেন যিনি অন্যের ছেলেকে বলছেন, সব ছেড়ে বিপ্লবের রাজনীতি করো, আর নিজের ছেলেমেয়েকে কেরিয়ার গড়তে পাঠাচ্ছেন। এই যে দ্বিচারিতা, তা দেখে তিনি ধাক্কা খেলেন। তাঁর মনে ধাক্কা দিল— ভারতবর্ষের এত বড় একটা মহান স্বাধীনতা আন্দোলন, যেখানে শত শত শহিদ আত্মদান করেছেন, ফাঁসিতে, গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন, কত বন্দি আন্দামানের জেলে থেকে পাগল হয়ে গেছেন, কত মা সন্তানহারা হয়েছেন, কত হাজার হাজার মানুষ জেলে কাটিয়েছেন— এত বড় একটা মহান আন্দোলন, তার পরিণতি কী দাঁড়াল? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের পরিবর্তে এল দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ। কেন এই ট্র্যাজিক পরিণতি হল? এই প্রশ্নটা তাঁকে ধাক্কা দিয়েছিল। এখান থেকেই তিনি বুঝেছিলেন, এ দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে কোনও পার্টি গড়ে ওঠেনি। তিনি বুঝেছিলেন, এ দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ব্যর্থতা ভারতের মাটিতে মার্ক্সবাদকে বিশেষীকৃত করতে না পারা। লেনিন বলেছেন, মার্ক্সবাদ যে জেনারেল লাইন বিশ্বের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছে তা হল সর্বহারা বিপ্লব। কিন্তু এটা বিশেষ ভাবে, বিশেষ দেশে, বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে। ইংল্যান্ডে যে ভাবে হবে ফ্রান্সে সে ভাবে হবে না, ফ্রান্সে যে ভাবে হবে রাশিয়ায় সে ভাবে হবে না, রাশিয়ায় যে ভাবে হবে জার্মানিতে তেমন করে হবে না। এটা হল কংক্রিটাইজেশন অফ মার্ক্সিজম ইন কংক্রিট সিচুয়েশন।

তা হলে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং এই সব অনুযায়ী এ দেশে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ কী হবে এটা তাঁরা ভাবেননি। তাঁরা চর্চা করেছেন মার্ক্সবাদের বই পড়া জ্ঞান। প্রথম যুগে তাঁরা সবাই সৎ ছিলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষও তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু যেখানে তাঁদের ব্যর্থতা, সেটা হচ্ছে মার্ক্সবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে না পারা। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদকে প্রয়োগ করা— স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সন্তানের

চারের পাতায় দেখুন

বিপ্লবী জীবনই মর্যাদাময়, দেখিয়েছেন শিবদাস ঘোষ

তিনের পাতার পর

সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক থেকে সামাজিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ। আমি কমিউনিস্ট, আমি মার্ক্সবাদী হলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, কমরেড শিবদাস ঘোষের আগে এ দেশে এ কথা কেউ ভাবেনি, চর্চাও করেনি।

স্ট্যালিনের গাইড লাইন মানেননি সিপিআই নেতারা

কমিউনিস্ট পার্টি বলে যে পার্টিটি ছিল তার নেতাদের মহান স্ট্যালিন ১৯২৫ সালে বলেছিলেন, ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ারা, পুঁজিপতিরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও বেশি ভয় পায় শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবকে। তারা আপসকামী। আর আছে মধ্যবিত্ত বিপ্লবীরা। এই মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের সাথে তোমরা যুক্ত হও, তাদের সাহায্য করো। কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস স্ট্যালিনের এই বক্তব্যের ঠিক বিপরীত।

মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে ভিত্তি করে। হরিপুরা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র। প্রেসিডেন্ট হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র আমাদের বন্ধু। আর জমিদারি প্রথার উচ্ছেদে আমাদের আন্দোলন করতে হবে, আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষককে শামিল করতে হবে। নেতাজির এই বক্তব্যের পরেই ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। পরের বার গান্ধীবাদীরা আর তাঁকে প্রেসিডেন্ট করতে রাজি হল না। প্রেসিডেন্ট পদে গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের বিপরীতে দাঁড় করালেন পট্টভি সীতারামাইয়াকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর গান্ধীবাদীদের ষড়যন্ত্র শুরু হল। তাঁরা প্রস্তাব আনলেন, প্রেসিডেন্টকে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হবে গান্ধীজির অনুমোদন নিয়ে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে গান্ধীজির অনুমোদন নিয়ে। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হিসাবে সুভাষচন্দ্রের হাত-পা বেঁধে দেওয়া হল। এই প্রস্তাবে সিপিআই সমর্থন করল গান্ধীবাদীদের। এর ফলে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করতে পারছিলেন না। তাঁকে বাধ্য করা হল পদত্যাগ করতে। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় তিনি কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। তার কিছুদিন পরেই ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানানোর কারণে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হল। সুভাষচন্দ্রকে কার্যত বহিষ্কার করল এই গান্ধীবাদীরা। তখনও সিপিআই সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়ায়নি।

সুভাষচন্দ্র এরপর লেফট কনসোলিডেশনের নামে কনভেনশন ডাকলেন বিহারের রামগড়ে। সিপিআইকে বললেন, তোমরা এসো, আমরা বামপন্থীরা একত্রিত হই। একত্রিত হলে এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হবে। সিপিআই সেই কনভেনশনে যোগ দেয়নি। সুভাষচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, কমিউনিজমের মতো এমন বিশ্বজনীন ভাবধারা এ দেশে যে জায়গা করতে পারল না, তার কারণ এ দেশে যাদের কমিউনিস্ট বলে ভাবা হয় তারা বন্ধুকে শত্রু গণ্য করে দূরে ঠেলে দেয়।

এরপর আপনারা জানেন, '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে এই সিপিআই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে যখন সুভাষচন্দ্র লড়ছিলেন, তখন এই কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে 'কুইসলিং' অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক এবং জাপানের দালাল বলেছিল। এই সব কিছু শিবদাস ঘোষের মনে ধাক্কা দেয়। তিনি বুঝেছিলেন, এরা মার্ক্সবাদের কথা বললেও যথার্থ মার্ক্সবাদী নয়, যথার্থ কমিউনিস্ট নয়। তা হলে এ রকম আচরণ করতে পারত না।

দাবি করলেই কেউ মার্ক্সবাদী হয় না

রাশিয়াতে 'রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি' মার্ক্সবাদী পার্টি হিসেবে পরিচিত ছিল। লেনিনও প্রথমে সেই পার্টির মধ্যে ছিলেন। কিন্তু লেনিন কিছু দিনের মধ্যে বুঝলেন ওই পার্টিটি মার্ক্সবাদের কথা বললেও মার্ক্সবাদী নয়। লেনিন বলশেভিক পার্টি গড়ে তুললেন। চিনেও এক সময় যাঁরা কমিউনিস্ট নেতা বলে পরিচিত ছিলেন মাও সে তুং তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষকেও এ দেশের মাটিতে একটা যথার্থ মার্ক্সবাদী পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হল। যে দিন তিনি শুরু করেছিলেন সে দিন মাত্র ছ'জন তাঁর সঙ্গী ছিল। লোকবল নেই, অর্থবল নেই, পরিচিতি নেই। দিনের পর দিন রেলের প্ল্যাটফর্মে কাটিয়েছেন, শিয়ালদার কোলে মার্কেটের ছাদে কাটিয়েছেন, ফুটপাতে কাটিয়েছেন, অনাহারে থেকেছেন। মাথা গোঁজার জায়গা পর্যন্ত তখন ছিল না। তিনি বলেছেন, শীত-গ্রীষ্ম কতকাল আমরা মাদুরে কাটিয়েছি, পাঁচটা পয়সা জোগাড় করতে পারিনি। কিন্তু তার জন্য আমরা আক্ষেপ করিনি। কারণ আমরা মনে করেছি এটা আমাদের ব্যর্থতা যে, আমরা লোককে বোঝাতে পারিনি। উনি বলেছেন, আমরা ত্যাগ করছি বলে আমাদের কোনও অহঙ্কার ছিল না। বলেছেন, আপাতদৃষ্টিতে দুঃখময় জীবন দেখে মানুষ ভাবে, এরা কত কষ্ট করছে। আমরা একটা মহত্তর জীবন গ্রহণ করেছি, মর্যাদাময় জীবন গ্রহণ করেছি।

সত্য থাকলে ইতিহাস মূল্য দেয়

এই সংগ্রামের একটা স্তরে ১৯৪৮ সালে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি গঠিত হয়। পঞ্চাশ সালে আমি দলে যুক্ত হই। কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন পার্টি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন— তাঁর মুখে শুনেছি, তাঁর বক্তৃতাতেও আছে— অনেকে তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করতেই চায়নি। তাঁরা বলেছেন যে, তাঁর এই চেষ্টাটা ঠিক নয়, এটা অবাস্তব। যাঁরা খানিকটা যুক্তি দিয়ে বুঝতেন, তাঁরা বলতেন, এ কথাগুলি ঠিক, কিন্তু তোমার লোকজন কই? তোমাকে কে চেনে, কে জানে? এত বড় দেশ, এত সব বড় বড় পার্টি, তুমি এখানে কী করবে! এ সব কথা তাঁরা যখন বলতেন তখন তিনি বলতেন, হয়তো আমি কিছুই করতে পারব না। তা হলে আপনারা আমাকে কী করতে বলেন? যা মিথ্যা তার কাছে নিজেকে বিক্রি করতে বলেন? গোলামি করতে বলেন? আমি তা করতে পারব না। আমি সত্য বলে যা বুঝেছি তার জন্য আমি মরতে মরতে লড়ব, লড়তে লড়তে মরব। আমাকে গুলি করে মারা যাবে কিন্তু আমি মিথ্যাকে গ্রহণ করব না। আমার মৃত্যুর খবরও হয়তো কেউ রাখবে না, কিন্তু আমার লড়াইয়ের মধ্যে যদি সত্য থাকে একদিন ইতিহাস তার মূল্য দেবে। ইতিহাস যে মূল্য দিয়েছে আজকের এই বৃহৎ সমাবেশ তারই প্রমাণ।

কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের প্যারেড। ৫ আগস্ট

আমাদের এমএলএ-এমপি আছে? মন্ত্রিত্ব আছে? যাঁরা এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজে চাঁদা সংগ্রহ করে, ট্রেনে, বাসে, গাড়ি ভাড়া করে এখানে এসেছেন। এই মিটিং-এর জন্য গত একমাস ধরে আমাদের কর্মীরা সারা রাজ্যে রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলেছেন। আমাদের দল কোনও বৃহৎ ব্যবসায়ীর কাছে, পুঁজিপতির কাছে হাত পাতে না। আমরা তাদের কাছে নিজেদের বিক্রি করিনি। আমরা জনগণের দরজায় যাই, রাস্তায় আমরা সাধারণ মানুষের কাছে হাত পাতি, চাঁদা তুলি। সে দিনও দল এই ভাবেই চলত, আজও এই ভাবেই চলছে। আজ ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, তাঁর বক্তব্যে সত্য থাকলে ইতিহাস তার মূল্য দেবে, সত্য ছিল বলেই ইতিহাস আজ মূল্য দিচ্ছে।

সমাজতন্ত্র ধ্বংস হল কেন?

আর একটা প্রশ্ন অনেককে ধাক্কা দেয়— তাঁরা বলেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা যে আপনারা বলেন, সমাজতন্ত্র তো টিকল না, ফলে সমাজতন্ত্র আপনারা প্রতিষ্ঠা করলেও যে তা টিকবে তার কী গ্যারান্টি আছে? এ বিষয়েও আমরা যা বলতে চাই তা এই যে, মার্ক্স থেকে শুরু করে কমরেড শিবদাস ঘোষ পর্যন্ত এ কথা কেউই দাবি করেননি যে, এক বার বিপ্লব হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে সেই সমাজতন্ত্র চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। বরং মার্ক্স বলেছেন, সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে পুরনো পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিগত ও নৈতিকতার ভিত্তির উপরে। এই ভিত্তি সমাজতন্ত্রের ভিত্তি নয়। মার্ক্স বলেছেন, সমাজতন্ত্র হল পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজম পর্যন্ত একটা অন্তর্বর্তী স্তর। এই স্তর কমিউনিজমের দিকে এগোতে পারে আবার প্রতিবিপ্লবের দ্বারা পুঁজিবাদেও ফিরে আসতে পারে। মার্ক্স এ কথাও বলেছেন, যতদিন না কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তত দিন বুর্জোয়া অধিকারবোধ থাকবে। এটা মার্ক্সের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। লেনিন বলেছেন, বিপ্লবের সময় পুঁজিবাদের যা শক্তি ছিল, বিপ্লবের পর পুঁজিবাদের সেই শক্তি শত-সহস্র গুণ বেড়ে যাবে। ফলে যে কোনও সময় সমাজতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে। আর স্ট্যালিন মৃত্যুর আগে হুঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছিলেন যে, আমরা ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছি, এ কথা ঠিক। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা যে মানসিকতা সেটা এখনও সমাজে মানুষের মনের মধ্যে রয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, এক দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা ক্ষেত্রে লেনিনবাদ-বিরোধী শক্তি কাজ করছে, আবার বাইরে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র কাজ করছে। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের দলের কর্মীরা ভাবছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমরা জিতেছি, ফলে আমাদের সামনে আর কোনও বিপদ নেই। তাঁরা আদর্শগত চর্চা বন্ধকরে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আদর্শগত চর্চা, তত্ত্বগত চর্চা, তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন—এটাই পার্টির প্রধান কাজ। এটাকে অবহেলা করলে পার্টির এবং রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তিনি বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক চিন্তা দুর্বল হলে পুঁজিবাদী চিন্তা সবল হবে। ১৯৫২ সালে স্ট্যালিন এই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। আত্মসন্তুষ্টিতে অন্ধ নেতা ও কর্মীরা এ কথায় গুরুত্ব দেননি। এই বক্তব্যের কয়েক মাস পরেই মহান স্ট্যালিনের মৃত্যু হয়।

অগ্রগতির মধ্যেও সমাজতন্ত্রের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছিলেন শিবদাস ঘোষ

সমাজতন্ত্র কেন ধ্বংস হল? তারও কিছু কারণ আছে। ধ্বংস হল, তার কারণ বিপ্লব হয়ে গেলেই জনগণ কমিউনিস্ট হয়ে যায় না। ৩০ কোটি জনগণের ১ কোটি পার্টি সদস্য হলেও, বাকি জনগণ তো কমিউনিস্ট বা মার্ক্সবাদী নয়। তা হলে সেই জনগণ কী? জনগণের মধ্যে বুর্জোয়া চিন্তার প্রভাব, সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব থেকে যায়।

পাঁচের পাতায় দেখুন

সমাজতন্ত্রের মধ্যে নতুন সভ্যতার উদয় দেখেছিলেন বিশ্বের মনীষীরা

চারের পাতার পর

ফলে এই প্রভাবটা পার্টির মধ্যে পড়তে থাকে। দ্বিতীয়ত, দলের মধ্যেও সব সদস্যই তো আর লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং নয়। যারা যত পিছিয়ে আছে, তার মানে হচ্ছে ততই তাদের মধ্যে পুঁজিবাদী চিন্তার প্রভাব রয়েছে। এ ছাড়া রাশিয়াতে যারা বিপ্লব করেছিল তারা দেখেছে ভয়ঙ্কর দারিদ্র, অনাহার, মৃত্যু। তারা এই সব সমস্যা সমাধানে বিপ্লবের জন্য প্রাণ দিয়ে লড়েছিল, দেশি-বিদেশি আক্রমণ থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করেছিল। তারপর তিন-চার প্রজন্ম চলে গিয়েছে। ১৯৫১-'৫২ সালের যে রাশিয়া, সেই রাশিয়ার বিরাট সম্পদ যারা ভোগ করেছে, তারা সেই দারিদ্র দেখেনি, তার যন্ত্রণা তারা উপলব্ধি করেনি। ফলে বিপ্লবের অনুভূতিও তাদের মধ্যে সে ভাবে কাজ করেনি। যেমন বিদ্যাসাগরের লেখা আমরা যখন পড়ি, এই মহান মানুষটি কী কঠিন লড়াই করেছেন আমরা তার কতটুকু বুঝি! ১১ আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল—ওই পর্যন্তই জানি। স্বদেশি আন্দোলন ও বিপ্লবীদের সম্পর্কে বেশির ভাগের ধারণা ওটুকুই। কারণ তার সাথে এখনকার যুবকদের আর প্রাণের যোগ নেই। ও দেশেও সঠিক বৈপ্লবিক শিক্ষার চর্চার অভাবে এমনটা ঘটেছিল। আর তার সাথে মিলেছিল ব্যক্তিবাদ। ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভিত্তি করে বুর্জোয়া বিপ্লবের উন্মেষের যুগে যে ব্যক্তিবাদের জন্ম হয়েছিল, তা এক সময় প্রগতিশীল ছিল। ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তির স্বাধীনতা, বুর্জোয়ারা এই বোধ এনেছিল। যতক্ষণ তারা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছে ততক্ষণ সেটা প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যখন পুঁজিবাদী শোষণ এসে গেল, তখন ব্যক্তিবাদ হয়ে পড়ল প্রতিক্রিয়াশীল। তা থেকেই ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা এগুলো এসে গেল, এগুলি কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। ফলে রাশিয়াতে বিপ্লবের সময় 'বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তিস্বার্থ গৌণ' এই চিন্তা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই চিন্তা অনেকটা ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের দিকে নিয়ে চলে গেছে। এটাকে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ। সমাজতন্ত্রে এই নতুন ধরনের ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে সঠিক আদর্শগত লড়াই যদি না হয়, তা হলে তা ব্যক্তির মধ্যে 'সমাজতন্ত্র থেকে কতটা কী সুবিধা ব্যক্তিগতভাবে পেতে পারি'— এই মানসিকতার জন্ম দেয়। এটাও তিনি দেখিয়ে গেছেন। আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের সামনে যে নৈতিক শিক্ষা, কমিউনিস্ট চরিত্রের শিক্ষা তিনি উত্থাপন করেছেন, তা শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পারিবারিক স্বার্থ ত্যাগ করা নয়— ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ, নাম করার ঝোঁক, প্রভাব-প্রতিপত্তির ঝোঁক, স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিবাদের প্রভাব— এর থেকেও নিজেকে মুক্ত করার শিক্ষা দিয়েছেন। ব্যক্তিকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ যে কমিউনিস্ট নৈতিকতা এনেছেন তা হল, সামাজিক স্বার্থই ব্যক্তিস্বার্থ, বিপ্লবের স্বার্থই ব্যক্তির স্বার্থ, বিপ্লবী দলের স্বার্থই ব্যক্তির স্বার্থ— এই ভাবেই একাত্ম হয়ে যাওয়া। আমাদের দলে এই শিক্ষা অর্জনের সংগ্রাম চলে। রাশিয়া এবং চিনের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই শিক্ষা তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। যেটা শেষজীবনে স্ট্যালিন উপলব্ধি করেছিলেন। আর একটা বিষয় কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, তা হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রাম হলেও চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, অভ্যাস-সংস্কৃতিতে গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণিসংগ্রাম করা হয়নি এবং মূলত সেখান থেকেই বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ ঘটেছে।

সমাজতন্ত্রের মধ্যে নতুন সভ্যতার উদয় দেখেছিলেন বিশ্বের মনীষীরা

১৯৪৮ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, বিশ্বে কমিউনিজমের বিরাট অগ্রগতিকে আমরা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু একটা দুর্বলতা থেকে গেছে, তা হচ্ছে, সংগঠন বাড়লেও উপযুক্ত আদর্শগত চিন্তা-চেতনা একই সাথে বাড়ানো হচ্ছে না। এর ফলে বহুলাংশে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে যান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে। যেটা '৪৮ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, সেটা স্ট্যালিনের '৫২ সালের বক্তব্যের মধ্যে আছে।

লেনিন বলেছেন, মার্ক্স-এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, যেটাকে বলে মার্ক্সবাদ। জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে তাকে ক্রমাগত উন্নত করে যেতে হবে। জীবনের গতির সাথে এগিয়ে চলতে এটা দরকার। চলমান জীবনে নতুন নতুন সমস্যা আসে, প্রশ্ন আসে, বিভ্রান্তি আসে, বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার আসে, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মার্ক্সবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। লেনিন পরবর্তী সময়ে এই কাজটি ঠিক মতো হয়নি। এর প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ।

সমাজতন্ত্র এনেছিল নতুন সভ্যতা। আমি বলতে চাই, ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে কোনও নতুন আদর্শ কোনও নতুন সমাজব্যবস্থার চূড়ান্ত বিজয় হতে সময় লাগে। পরাজয়, পরাজয়, জয়। পরাজয়, জয়— এই পথেই চলতে থাকে। এমনকি ধর্ম প্রচার করছেন যাঁরা, যাঁরা বলতেন যে তাঁরা ঈশ্বর প্রেরিত, সেই ধর্ম প্রচার করতে গিয়েও শত শত বছর তাঁদের লড়তে হয়েছে। কোনও ধর্মই মানুষ দু-চার দিনে গ্রহণ করেনি, সময় লেগেছে। দাসপ্রথা থেকে রাজতন্ত্র আসতে কয়েকশো বছর সময় লেগেছে, সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদ আসতে ৩৫০ বছর লেগেছে। আর এই সবকটি হচ্ছে শোষণমূলক ব্যবস্থা। দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ সবগুলি সমাজই শোষক-শোষিত, ধনী-গরিবে বিভক্ত। আর সমাজতন্ত্র হচ্ছে প্রথম শোষণমুক্ত সমাজ। তা হলে কয়েক হাজার বছর ধরে টিকে থাকা শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেলড়তে হয়েছে সমাজতন্ত্রকে। সেই অর্থে ৭০-৮০ বছর কতটুকু সময়?

যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়, চিনের বিপর্যয় দেখে মার্ক্সবাদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন, সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন, তাঁরা ভুল করছেন। তা হলে তো তাঁদের কাছে ব্যাপারটা দাঁড়াবে, যা চলছে তাই ভাল। আমেরিকা যা করছে ঠিক করছে, ভারতবর্ষের শাসকরা যা করছে ঠিক করছে! এটাই কি আপনারা চান, নাকি এর পরিবর্তন চান? পরিবর্তন করতে হলে মার্ক্সবাদই একমাত্র পথ, সমাজতন্ত্রই একমাত্র রাস্তা। আগামী দিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই প্রতিবিপ্লব থেকে শিক্ষা নেবে। যেমন সোভিয়েত বিপ্লব প্যারি কমিউন থেকে শিক্ষা নিয়েছিল।

মনে রাখবেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের এত অগ্রগতি দেখেই ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে এসেছি'। 'রাশিয়ার চিঠি'তে লিখছেন, ফরাসি বিপ্লব সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান তুলেছে, কিন্তু কার্যকর করতে পারেনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেটা কার্যকর করছে। সোভিয়েত সমাজ ১০-১৫ বছর ধরে হাজার বছরের ইতিহাসের বিরুদ্ধে লড়ছে। তিনি বলছেন, এই একটা দেশ 'লিগ অফ নেশনে' বলেছে, সমস্ত অস্ত্র ধ্বংস করো, যুদ্ধের দরকার নেই। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলো কেউই রাজি হয়নি। ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন, নবযুগের নতুন রূপ, মানবের যে তপোভূমিতে দেখেছি সেটা সোভিয়েত

ছয়ের পাতায় দেখুন

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে সমাবেশের একাংশ। ৫ আগস্ট

এসইউসিআই(সি)-র মধ্যে উন্নত নৈতিকতা অর্জনের নিরন্তর সংগ্রাম চলে

পাঁচের পাতার পর

ইউনিয়ন। আশা এবং আনন্দের এ রকম স্থায়ী কারণ আর কোথাও পাইনি। আমি জানি প্রকাণ্ড বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই এ জিনিস এসেছে। এই বিপ্লব বহুদিনের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। তিনি বলেছেন, নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার বুকের পাঁজর থেকে মৃত্যুশেল তুলবার চেষ্টা করছে, সেই মৃত্যুশেল হচ্ছে লোভ, অর্থাৎ লোভমুক্ত সমাজ সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তুলছে। আজ যে সব বুদ্ধিজীবীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার করেন, তাঁরা ভাবুন, রবীন্দ্রনাথ কি কিছু বুদ্ধি রাখতেন না? তিনি কি ইন্টেলেকচুয়াল ছিলেন না? আপনারাই বিচার করে দেখুন।

সে যুগের আর একজন মনীষী রমাঁ রলাঁ, যাকে রবীন্দ্রনাথও শ্রদ্ধা করতেন, তিনি লিখছেন, আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শ এবং কর্মে বিশ্বাসী। যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনও দিন ধ্বংস হয় তখন বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণিই শুধু ক্রীতদাস হবে না, মানবসভ্যতা কয়েক যুগ পিছিয়ে যাবে। শরৎচন্দ্র সমাজতন্ত্রের জয়গান গেয়ে গেছেন পথের দাবী উপন্যাসে, প্রেমচন্দ সমাজতন্ত্রের পক্ষে লিখেছেন। সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী সমাজতন্ত্রের পক্ষে লিখেছেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মানি নতুন মহান আদর্শ মার্ক্সবাদ দিয়েছে, আর বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। যখন আইএনএ বাহিনী পরাস্ত, সুভাষচন্দ্র তাঁর শেষ ভাষণে বলছেন, এখনও মার্শাল স্ট্যালিন বেঁচে আছেন, মার্শাল স্ট্যালিনই নির্ধারণ করবেন বিশ্ব আগামী দিনে কোন দিকে যাবে। নজরুল আন্তর্জাতিক সঙ্গীত রচনা করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে। এঁদের কি বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করবেন? বার্নার্ড শ বলেছেন, গণতন্ত্র যদি কোথাও পেতে চাও সোভিয়েত ইউনিয়নে যাও। যেখানে মার্শাল স্ট্যালিন আজও জীবিত আছেন। আজ এই মহান স্ট্যালিনকে নিয়েও কত কুৎসা। যারা রাশিয়ার সমাজতন্ত্র ধ্বংস করেছে তাদের মধ্যে প্রথম ছিল পুঁজিবাদের দালাল ক্রুশ্চেভ। এই ক্রুশ্চেভ জানত, সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে হলে স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করতে হবে। অথচ এই মহান স্ট্যালিনকে সকলেই সে যুগে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। যে সমাজতন্ত্র তিনি লেনিনের মৃত্যুর পর গড়ে তুলেছিলেন তা এমন একটি দেশ গড়ে তুলেছিল যেটা আপনাদের মনে হবে একটা কল্পনা। সে দেশে বেকার সমস্যা বলে কিছু ছিল না, বরং রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল, যদি তুমি কাজ না করো তোমার খাবার জুটবে না। প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। সে দেশে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে জল পেত, জ্বালানি পেত, বিদ্যুৎ পেত, শ্রমিকরা বিনামূল্যে পরিবহণ পেত, পোশাক পেত। দেশের শ্রমিকরা বছরে ১৫ দিন সবেতন ছুটি পেত, যাতে সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের ধারে স্বাস্থ্য উদ্ধারে যেতে পারে। সমস্ত ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যচর্চা করানো হত, সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। সকল বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পীর জীবনযাত্রার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়েছিল। গ্রামে-শহরে অসংখ্য ক্লাব, সিনেমা হল, থিয়েটার মঞ্চ, লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই দেশের সংবিধান কারা রচনা করেছে? আমাদের দেশের সংবিধান বুর্জোয়া পণ্ডিতরা রচনা করেছেন। আর সোভিয়েত ইউনিয়নে খসড়া সংবিধান জনগণের কাছে দেওয়া হয়েছিল। কোটি কোটি লোক তা পড়েছে, সংশোধন করেছে, প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে সোভিয়েত সংবিধান। এই রকম ভাবে সংবিধান বিশ্বে আর কোথাও রচিত হয়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জনপ্রতিনিধিরা হতেন সত্যিকারের শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধি। এইসব বুর্জোয়া গণতন্ত্রে কোথাও শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ আছে? একমাত্র বুর্জোয়া দলের দালাল হতে পারলে আলাদা কথা। ওখানে শ্রমিক-কৃষকরাই প্রতিনিধি হতেন। ওখানে যিনি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতেন তাঁকে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে হত ভোটারদের কাছে। প্রয়োজনে নাগরিকরা তাকে বাতিল করতে পারত, একে বলা হয় 'রাইট টু রিকল'। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিনামূল্যে সকলের ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়ার বন্দোবস্ত ছিল, বিনামূল্যে সকলের চিকিৎসার সুযোগ ছিল। হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছিল। নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হচ্ছিল। সেখানে নিত্যনতুন নানা ধরনের আবিষ্কার ঘটছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৬ জন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। পুঁজিবাদী দুনিয়া এই পুরস্কার দিতে বাধ্য হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি দেখে। সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম মহাকাশে মানুষ পাঠায়, উপগ্রহ পাঠায়। এই ভাবে ইতিহাস তৈরি হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে।

আজ যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে থাকত তা হলে গাজায় এই ভাবে আক্রমণ ঘটতে পারত? ইউক্রেনের যুদ্ধ হতে পারত? ১৯৫৬ সালের কথা বলছি, মিশরে সুয়েজ ক্যানাল বলে একটা খাল আছে। তার মালিক ছিল ব্রিটিশ-ফরাসি কোম্পানি। মিশর সরকার তার জাতীয়করণ করে। অমনি ইংল্যান্ড-ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদ মিশর আক্রমণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করল, ১২ ঘণ্টা সময় দিলাম— হয় আক্রমণ বন্ধ করো, না হলে আমরা লন্ডন, প্যারিসে বোমা ফেলব। লন্ডন, প্যারিসের জনগণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলল, তোমাদের সাথে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। তোমাদের সরকার অন্যায় ভাবে মিশর আক্রমণ করেছে। তোমরা সেটা বন্ধ করাও। ১২ ঘণ্টা লাগেনি, ৬ ঘণ্টার মধ্যে ফ্রান্স-ইংল্যান্ড মিশর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে ব্রিটিশ এবং ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ সেই আক্রমণ করেছিল।

এই সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো আজ কোনও দেশ আছে? গাজাতে ইজরায়েল নরহত্যা চালাচ্ছে, নরমেধ যজ্ঞ যাকে বলা যায়। শিশুদেরও পর্যন্ত তারা গুলি করে মারছে। নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা চরমে পৌঁছেছে। তার পক্ষে দাঁড়িয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যে গণতন্ত্রের পূজারি বলে অভিহিত। প্রথম মহাযুদ্ধ কারা বাধিয়ে ছিল? দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাধিয়েছিল বিশ্বের বাজার লুণ্ঠন করার জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কারা বাধিয়েছিল? দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্ব লুণ্ঠন করার জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন কি কখনও কোনও দেশ আক্রমণ করেছিল? ভারত সহ এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এইসব দেশকে উপনিবেশ করে কারা লুণ্ঠন করেছিল? এই সাম্রাজ্যবাদীরাই। ইরাককে ধ্বংস করল কী করে? একটা মিথ্যা অভিযোগ এনে যে, ইরাকে ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র আছে, মাটি খুঁড়েও যেটা পাওয়া যায়নি। ইরাক ধ্বংস করল, রাষ্ট্রনায়ক সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দিল। লিবিয়াকে ধ্বংস করল, রাষ্ট্রনায়ক গদ্দাফিকে হত্যা করল। আফগানিস্তানে ধ্বংসকাণ্ড চালাল, এর আগে ভিয়েতনামে আমেরিকা নাপাম বোমা পর্যন্ত ফেলেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা কে ফেলেছিল? এই সব অমানবিক কাজ কে করল? সমাজতন্ত্র নাকি সাম্রাজ্যবাদ?

স্ট্যালিনকে আক্রমণ করা মানেই লেনিনবাদকে আক্রমণ করা

মহান নেতা স্ট্যালিনকে ইতিহাসে কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা চলছে। কিন্তু তাঁকে কালিমালিপ্ত করা যায় না। স্ট্যালিন মহান চরিত্র। জার শাসিত রাশিয়া ছিল সব দিক থেকে খুবই অনুন্নত। বিপ্লবের পর কয়েক বছর বাদেই মহান লেনিনের মৃত্যু হয়। এর পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়ে বহু ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও অতিক্রম করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ইটালি ও জাপানের পরাজয় সম্ভব হয়েছিল মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রেড আর্মি ও সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায়। অনেকেই জানেন না, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রোগাক্রান্ত শয্যাশায়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বারবার খোঁজ নিতেন রেড আর্মি কত দূর এগোল। তাঁর অপারেশনের দিন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সংবাদ দিলেন, রেড আর্মি নাৎসি বাহিনীকে পরাস্ত করে এগোচ্ছে। ওই অবস্থাতেও রবীন্দ্রনাথের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হল। পরম বিশ্বাসে বললেন, 'পারবে, ওরাই পারবে।' সত্যিই ওরা পেরেছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ তা দেখে যেতে পারেননি। শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, বার্নার্ড শ, রমাঁ রলাঁ, আইনস্টাইন থেকে সমগ্র বিশ্বের ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনগণ পরম আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে মহান স্ট্যালিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাকিয়ে ছিল।

স্ট্যালিনের জীবনযাত্রাও ছিল অতি সাধারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে চমকে গিয়েছিলেন। তিনি বলছেন, ব্রিটেনের ক্লাস ফোর শ্রমিকরা যে ধরনের কোয়ার্টারে থাকেন, স্ট্যালিন সেই রকম একটা ঘরে থাকেন। সিডনি ওয়েব এবং তাঁর স্ত্রী রাশিয়ায় গিয়ে স্ট্যালিনের স্ত্রীকে খুঁজছেন। শুনলেন, তিনি কারখানায় কাজ করেন। তাঁরা ভাবলেন স্ট্যালিনের স্ত্রী হয়তো ম্যানেজার। তাঁরাও অপেক্ষা করছেন, দেখলেন এক মহিলা বেরিয়ে আসছেন অন্য শ্রমিকদের সাথে। তিনিই স্ট্যালিনের স্ত্রী। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি শ্রমিক, আর আপনার স্বামী রাষ্ট্রনায়ক। উনি বললেন, তিনি তাঁর গুণে রাষ্ট্রনায়ক, আমি আমার গুণে শ্রমিক। স্ট্যালিনের ছেলেমেয়ে যে স্কুলে পড়ত, বলা ছিল, তাঁদের পিতৃ পরিচয় সেখানে কেউ জানবে না। তারা যেন কোনও বিশেষ সুবিধা না পায়। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তাঁর দেহরক্ষী রিবিন লিখছেন, তাঁর মাত্র তিন-চারটে পোশাক ছিল। ছিঁড়ে গেলে স্ট্যালিন বলতেন, সেলাই করে দাও। জুতো বহুদিন হলেও বাতিল করার কথা ভাবতেন না। স্ট্যালিন তাঁদের সাথে গল্প করতেন, আড্ডা দিতেন। তাঁর দেহরক্ষী লিখছেন, তিনি যেন আমাদেরই একজন। তিনি ছিলেন শ্রমিকের সন্তান এবং সারা জীবন শ্রমিকের মতোই থেকেছেন। যে বিচার নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার হয়, সেই মস্কো ট্রায়াল আসলে কীসের বিচার? হিটলারের পঞ্চম বাহিনী বলে একটা বাহিনী ছিল। দেশে দেশে হিটলার তার গুপ্তচর দালাল তৈরি করেছিল। রাশিয়াতেও যারা ক্ষমতা দখল করতে চাইছিল তাদের নিয়ে হিটলার তৈরি করতে চেয়েছিল এই রকম বাহিনী। পরিকল্পনা ছিল যুদ্ধের সময় হিটলার আক্রমণ করবে আর এরা ভিতরে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করবে। প্রথম সারির নেতা কিরভকে এই চক্র খুন করার পর এই চক্রান্ত ধরা পড়ল। তারপর অভিযুক্তদের বিচার হয়। এই ট্রায়াল বিশ্ববিখ্যাত। কারণ যাদের বিচার হয়েছে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী হলেও প্রকাশ্যে বিচার হয়েছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, সাংবাদিক, আইনজ্ঞদের ডাকা হয়েছিল। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত লিখেছেন, এ রকম নিরপেক্ষ বিচার কোনও দিন দেখিনি। বন্দিদের চেহারায় কোথাও এতটুকু অত্যাচারের ছাপ ছিল না। এই ট্রায়ালের সময় রবীন্দ্রনাথ জীবিত, নেতাজি সুভাষচন্দ্র জীবিত, বার্নার্ড শ, রমাঁ রলাঁ, আইনস্টাইন জীবিত। তাঁরা কেউ এর বিরুদ্ধতা করেননি। অথচ, এখন এই নিয়ে প্রচুর কুৎসা রটানো হচ্ছে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে, তাকে শাসকরা কি ছেড়ে দেবে? কোনও রাষ্ট্র ছেড়ে দেবে? তা হলে এইসব কুৎসার জবাব আপনাদের দিতে হবে। স্ট্যালিন এক মহান চরিত্র। ১৯৫৬ সালে বিশ্বে কমরেড শিবদাস ঘোষই প্রথম বলেছিলেন, স্ট্যালিনকে আক্রমণ করা মানে লেনিনবাদকে আক্রমণ করে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করা। বাস্তবে ঘটলও তাই।

নির্বাচনের রাস্তায় সমস্যার সমাধান নেই

আপনারা নিজেরাই জানেন, দেশ আজ চূড়ান্ত সংকটের সম্মুখীন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবন— কোথাও মানুষের এতটুকু আশার আলো বলে কিছু নেই। গোটা বিশ্বব্যাপী এই সংকট। আমাদের দেশেও পুঁজিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। একচেটিয়া পুঁজি, লগ্নিপুঁজি মাল্টিন্যাশনালের জন্ম দিয়েছে। ভারত শুধু পুঁজিবাদী দেশ নয়, সাম্রাজ্যবাদী দেশ। এ দেশের ১০ শতাংশ লোক ৭৫ শতাংশ সম্পদের মালিক

সাতের পাতায় দেখুন

ধর্মান্ধতা, অন্ধতা বাড়াতে চাইছে বিজেপি

ছয়ের পাতার পর

আর বাকি ৯০ শতাংশ লোক ২৫ শতাংশ সম্পদের মালিক। এই ৯০ শতাংশের মধ্যে আবার বেশিরভাগ অর্থাৎ এদের ৯০ শতাংশ এতটাই গরিব যে তারা ১ শতাংশ সম্পদেরও মালিক নয়। এই হচ্ছে দেশের অবস্থা। কোটি কোটি বেকার। এই সংখ্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। যত নতুন নতুন যন্ত্র আসছে, তত কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, ছাঁটাই হচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশের পার্থক্য দেখুন। সমাজতান্ত্রিক দেশেও নতুন যন্ত্র এসেছে, তাতে উৎপাদন বাড়লেও শ্রমিকদের শ্রম-সময় কমেছে। তারা আট ঘণ্টার পরিবর্তে সাত ঘণ্টা পরিশ্রম করেই বিশ্রাম কিংবা অন্যান্য সৃজনশীল কাজের জন্য অবকাশ পেত। স্ট্যালিন মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন, শ্রমিকরা সাত ঘণ্টার পরিবর্তে ছ'ঘণ্টা পরিশ্রম করবে, ক্রমাগত শ্রম-সময় কমবে। ফলে ক্রমাগত উৎপাদন বাড়াতে আরও শ্রমিকের প্রয়োজন হবে, কেউ ছাঁটাই হবে না। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যন্ত্র আসে শ্রমিককে ছাঁটাই করার জন্য।

আমাদের দেশে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। নেতারা যত দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলছেন, ততই তাঁরা নিজেরা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হচ্ছেন। এই হচ্ছে গোটা দেশের অবস্থা। এর থেকে পরিত্রাণ কি ভোটের মাধ্যমে হবে? মানুষ ভাবে, একবার তো কংগ্রেসকে দেখলাম, এ বার সিপিএমকে দেখি। সিপিএমকে দেখলাম, এ বার তা হলে তৃণমূলকে দেখি। এ বার তৃণমূলকে দেখলাম, তা হলে বিজেপিকে দেখি। এই চিন্তার গোলকধাঁধায় মানুষ ঘুরতে থাকে। এই ব্যবস্থায় ভোট কী? নির্বাচন কী? বুর্জোয়া ব্যবস্থায় নির্বাচন আসলে একটা প্রহসন। 'বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল' এখন বইয়ের কথা। জনগণ কি ভেবেচিন্তে ঠিক করছে যে, কাকে ভোট দেওয়া উচিত আর কাকে নয়, কারা রাজনৈতিক ভাবে সঠিক আর কারা ভুল? এ ভাবে কি ভোট হয়? ভোট কে পাবে তা ঠিক করে পুঁজিপতি শ্রেণি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচন মানে কারখানার মালিক যেমন তার নিজের প্রয়োজনে ম্যানেজার ঠিক করে অনেকটা সে রকম। পুঁজিপতিরা তাদের জন্য পলিটিক্যাল ম্যানেজার অর্থাৎ মন্ত্রিসভা ঠিক করে। পুঁজিবাদের হয়ে তাঁরা ম্যানেজারি করেন। আর সরকারি দলগুলো ভোটের সময় নানা অনুদান, এই ভাণ্ডার, অমুক শ্রী, তমুক শ্রী এইসব ঘোষণা করে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, কারণ তিনিই এই সব ভাণ্ডার চালু করেছেন। এখন বিজেপি এবং সব ভোটসর্বস্ব দলগুলো অন্যান্য রাজ্যে তাই করছে। কারণ এতে সহজে ফল পাওয়া যায়। সারা বছর না খাইয়ে রেখে ১ হাজার, ২ হাজার টাকা হাতে দিয়ে দিল! নিঃস্ব মানুষ ভাবে, তবুও তো কিছু দিল! কিন্তু এতে কি সংসার চলবে? এ যেন আগেকার দিনে জমিদাররা যেমন সারা বছর রক্ত শুষে খাজনা আদায় করে পাপস্খালন করতে বছরে একবার কাঙালি ভোজন করাত, অনেকটা সে রকম। ভোটের আগে এখন এই রকম কাঙালি ভোজন করায় ভোটসর্বস্ব দলগুলো। অথচ, এটা সরকারি টাকার সম্পূর্ণ অপচয়। এর বিনিময়ে কোনও উৎপাদন হচ্ছে না। এই টাকা কৃষিতে ব্যয় হতে পারত। এই যে বন্যায় কত কিছু ধ্বংস হচ্ছে, এই যে নদীগুলো ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নদী খনন করা গেলে এই বন্যা হয়? হয় না। এই টাকায় কত কলকারখানা করা যায়, শিল্প করা যায়— তাতে উৎপাদন বাড়ে। পাবলিকের টাকা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যয় না করে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় না করে এই সব করছে। হাসপাতালগুলোর কী দুর্দশা! সারা দেশে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছে। আর শিক্ষার নামে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে কী হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। সেই কোন যুগে নবজাগরণের পথপ্রদর্শক রামমোহন রায় বলেছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষা মানুষকে কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে দিচ্ছে, তাদের অন্ধকারে রাখছে। সংস্কৃত শিক্ষা চাই না। তিনি বলেছেন, বেদান্ত বাস্তব জগতকে অস্বীকার করে। বেদান্ত শিক্ষার দ্বারা আধুনিক নাগরিক গড়ে উঠবে না। এর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা চাই। বিদ্যাসাগর আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তাঁর চেহারা দেখলে মনে হয় তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি সেই যুগে ঘোষণা করেছিলেন, সাংখ্য ও বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন। চাই ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা, যুক্তিবাদী দর্শন, যা পড়ে এ দেশের ছাত্র যুবকরা বুঝবে কেন বেদ-বেদান্ত আজ পথ দেখাতে পারবে না।

ধর্মান্ধতা, অন্ধতা বাড়াতে চাইছে বিজেপি

বিদ্যাসাগর কোনও মন্দিরে কোনও দিন যাননি। রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাড়ি গিয়েছিলেন শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। বলেছিলেন, একবার রাসমণির বাগান দেখতে অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে আসুন। বিদ্যাসাগর যাননি। আর একজন মনীষী মহারাষ্ট্রের জ্যোতিবা ফুলে, তিনিও ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে ছিলেন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লড়েছেন। আজ বিজেপি ভারতবর্ষকে আবার পিছিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে মনুসংহিতার যুগে, বেদ-বেদান্তের যুগে। বিজেপি সংস্কৃত শিক্ষার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা চাইছে, অন্ধতা বাড়ুক, অজ্ঞতা বাড়ুক, ধর্মান্ধতা বাড়ুক। তা হলে মানুষের যুক্তিবাদী মন থাকবে না, প্রশ্ন করার, তর্ক করার মন থাকবে না। প্রতিবাদ করার লোক থাকবে না। এগুলো তাদের প্রয়োজন। এটা একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ যা মনুষ্যত্বকে, নৈতিকতাকে ধ্বংস করবে।

এই যে সামনেই ১১ আগস্ট আসছে। কত জন খোঁজ রাখে, সে দিন এক কিশোর কী জন্য কী ভাবে প্রাণ দিয়েছিলেন! ২৯ জুলাই চলে গেল, কতজন খোঁজ রাখে বিদ্যাসাগরের। তাঁদের সম্বন্ধে খবরের কাগজে দু-লাইনও থাকে না। সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কেও থাকে না। খবরের কাগজে থাকে কোন ফিল্মস্টারের সাথে, কোন ক্রিকেট প্লেয়ারের সাথে কার প্রেম, কার বিচ্ছেদ, কার সন্তানের কী হল তার বিরাট ছবি, বিবরণ। আগেও তো ফিল্ম ছিল, ক্রিকেট ফুটবল ছিল, এই রকম সব প্রচার হত? এখন এগুলোই প্রচার হয়। যুবকদের ওপর নেমে আসছে এক ভয়াবহ আক্রমণ। না হলে এত ধর্ষণ হয়? এই সব নৃশংসতা বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুভাষচন্দ্র কোনও দিন দেখেছেন? ধর্ষণ, গণধর্ষণ কলেজে হোস্টেলে এখানে সেখানে প্রায় রোজই হচ্ছে। শিক্ষক ছাত্রীকে ধর্ষণ করছে, বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করছে, সত্তর বছরের বৃদ্ধাকে ধর্ষণ করছে, পাঁচ বছরের শিশু কন্যাও রেহাই পাচ্ছে না। এই ধর্ষকরা কি মানুষ? এ সব এমনি এমনি ঘটছে? এগুলো মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করার একটা প্রক্রিয়া। মদ খাও, জুয়া খেলো, সাট্টা খেলো। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে মোবাইল অ্যাডিকশন, ড্রাগ অ্যাডিকশন আর ভোগ লালসা, চকচকে পোশাক পরিচ্ছদ— কনজিউমারইজম। আরও ভয়াবহ হচ্ছে সেক্স অ্যাডিকশন। সেক্স যেন লাইফের প্রাইম মোটিভ হয়ে উঠছে। জীবনের প্রধান লক্ষ্য যেন যৌন আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করা! গোটা দেশেই এই জিনিস চলছে। গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদ মানুষকে অমানুষ করে তুলছে। মনুষ্যত্ব ধ্বংস করছে। এ এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ। পারিবারিক জীবনে শান্তি নেই। বৃদ্ধ বাবা-মাকে খুন করে সন্তান সম্পত্তি দখল করছে। রাস্তায় বাবা-মাকে বের করে দিয়ে বাড়ি দখল করছে। আবার কেউ কেউ বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছে। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দায়িত্ব নেবে না, বড়জোর কিছু টাকা দিয়েই খালাস। এইসব জিনিস এল কোথা থেকে? পুঁজিবাদ নিয়ে এল।

এই পুঁজিবাদ আরেকটা আক্রমণ চালাচ্ছে সেটা হল গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়াচ্ছে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়াচ্ছে। পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে, বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হচ্ছে, সমুদ্র জল উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে, ফলে সমুদ্র ধীরে ধীরে স্থলভাগ গ্রাস করছে। হিমালয়ের যে সব গ্লেসিয়ার থেকে নদীগুলি এসেছে, তাও গলে যাচ্ছে। আগামীতে আরও ভয়ঙ্কর দিন আসছে, কিন্তু পুঁজিবাদ এই গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপাদন বন্ধ করবে না। ফলে এই পুঁজিবাদ সমস্ত দিক থেকে মানবতার শত্রু, এর বিরুদ্ধে লড়াই প্রয়োজন। আর লড়াই করতে হলে চাই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা।

আমরা একটা পাল্টা নৈতিক সংগ্রাম চালাচ্ছি

কমরেড শিবদাস ঘোষ সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন নৈতিকতার ওপর, চরিত্রের ওপর। তিনি বলেছেন, যে কোনও আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে উন্নত নৈতিকতার মধ্যেই। বিপ্লবী আদর্শের প্রাণ হল উন্নত নৈতিকতা। আমাদের দলে এর একটা নিরন্তর সাধনা চলে। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন প্রথমে তোমরা শিখবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নেতাজি, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্য সেন, বিনয় বাদল দীনেশ— এঁদের থেকে। এঁদের থেকে শিখলে পরবর্তী ধাপে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন সম্ভব। তাই দেখবেন অন্যেরা না স্মরণ করলেও আমাদের দলের কর্মীরা দেশের সর্বত্র মনীষী এবং বিপ্লবীদের জন্মদিন মৃত্যুদিন উদযাপন করেন। আমাদের কাছে এটা একটা মামুলি অনুষ্ঠান নয়। এর থেকে আমরা নিজেরাও শিক্ষা নিই, অন্যেরাও যাতে শিক্ষা নেয়, তার জন্য অনুপ্রাণিত করি। আমরা একটা পাল্টা সংগ্রাম চালাচ্ছি— নৈতিক সংগ্রাম। এক দিকে ওরা চরিত্র মনুষ্যত্ব ধ্বংস করছে। এই সব রাজনৈতিক দলগুলি ক্লাবগুলোকে টাকা দিয়ে কিনতে চায়। দুর্গা পুজোয় এই জন্যই তারা টাকা দেয়, কুম্ভ মেলায় টাকা ঢালে। এই রকম আরও নানা জায়গায় তারা টাকা খরচ করে। এই সব কীসের জন্য করে? ধর্মান্ধতা বাড়ানো শুধু নয়। তাদের চেষ্টা যুবকদের এতে ব্যস্ত রাখা। এই যুবকদের ভোটের সময় তাদের দরকার। এই যুবকরাও জানে, ভোটের সময় তাদের প্রয়োজন হবে। ফলে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। খুন করতে পারে, লুট করতে পারে, ছিনতাই করতে পারে, নারী ধর্ষণ করতে পারে— তাদের সাত খুন মাফ। কারণ সরকারি দল তাদের ছাড়া চলে না। দেশের সমস্ত ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলো বেকার যুবকদের নিয়ে এই রকম বাহিনী গড়ে তুলেছে। তারা টাকা পায়, মদ খায়, মাংস খায়, ফুর্তি করে। এও আর এক রকম বিপদ। ফলে সমস্ত দিক থেকেই আমাদের একটা রাজনৈতিক, নৈতিক, আদর্শগত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে গ্রামে ও শহরে। যদি ভাবেন, আমরা রাজনীতি বুঝি না, আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা মূর্খ মানুষ—ওই নেতারাই যা হোক ঠিক করবে। এই ভাবে ভাবলে কিন্তু চলবে না। এ দেশের মানুষ এ কথা ভাবার ফলেই বারবার ঠকেছে। স্বদেশি আন্দোলনে গান্ধীজি ঠিক না কি নেতাজি ঠিক, ক'জন বুঝেছিল, ক'জন তলিয়ে দেখেছিল, ক'জন ভেবেছিল! তার পরিণাম যা হওয়ার হয়েছে। নেতাজিকে এই দেশ ছাড়তে হত না যদি তিনি এ দেশের মানুষের সক্রিয় সমর্থন পেতেন। আজও নেতারা চায়, মানুষ অন্ধ থাকুক, অজ্ঞ থাকুক। নেতারা ভাবে, কিছু টাকা ছড়িয়ে দেব আর খবরের কাগজ, টিভি, সমাজমাধ্যমকে টাকা দিয়ে কিনে নেব। তারা ওদের হয়ে প্রচার করবে। বিরাট বিরাট ছবি ছাপাবে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে কাটআউট থাকবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনও দিন নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কাট আউটের প্রয়োজন হয়েছে, দেশবন্ধুর কাট আউটের প্রয়োজন হয়েছে? এখনকার নেতাদের ছবি পাবেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এ না হলে মানুষের মনের মধ্যে তাদের জায়গা তৈরি হয় না। এই হচ্ছে নেতাদের অবস্থা। ফলে এ সবের বিরুদ্ধে একটা বিরাট সাংস্কৃতিক আন্দোলন চাই।

শিশু-কিশোরদের সাথে সময় দিন

আমি শুধু দলের কর্মীদের বলছি না, এই বিশাল জনসভায় উপস্থিত আপনাদের সকলকে বলছি— সাত-আট বছর, নয়-দশ-এগারো বছরের ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্কুলে, কলেজে এদের মধ্যে মদ নিয়ে আলোচনা হয়, মদ খেয়ে জন্মদিন উদযাপন করে। যা আগে অভাবিত ছিল। সেক্স নিয়ে তাদের আলোচনা হয়, এমনকি তার মধ্যে জড়িয়ে যায়। তাই আমি এই বিশাল সমাবেশে উপস্থিত আপনাদের প্রত্যেকের বিবেকের কাছে বলছি, আমাদের কর্মীরা এখনও যাঁরা করছেন না, তাঁদেরও বিবেকের সামনে বলছি যে, রবিবার দিন সকাল বেলা এক ঘণ্টা কষ্ট করে সময় দিন। পাড়ার ছেলেমেয়েদের জড়ো করে খেলাধূলা করান, গান-নাটক করান। তার সাথে ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, ভগৎ সিং কে ছিলেন, বিদ্যাসাগর কে ছিলেন তা শেখান। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ,

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 4 Bengali Weekly August 22, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

ভর্তি শুরু হল না কলেজে

একের পাতার পর

দিতে পারত। রাজ্যের কলেজগুলিতে ৬ লক্ষের বেশি আসনে আবেদন করেনি ছাত্র-ছাত্রীরা। ফলে সংরক্ষিত অসংরক্ষিত কোনও আসনই সম্পূর্ণ ভর্তি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই রাজ্য সরকার চাইলেই আবেদনকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে কলেজগুলিতে ভর্তি নিতে পারে। কোনও সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর বঞ্চিত হওয়ার কারণই নেই। এআইডিএসও-র আশঙ্কা, যে ভাবে স্নাতক স্তরে ভর্তি নিয়ে টালবাহানা করছে রাজ্য সরকার তার ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা থেকে আরও মুখ ফেরাবে এবং বহু আসন ফাঁকা পড়ে থাকবে। শিক্ষকরা বলছেন, সিবিসিএস ব্যবস্থায় প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা হওয়ার কথা ডিসেম্বরে। যে ছাত্রছাত্রীরা আজও ভর্তিই হতে পারল না, তারা কী পড়ে কেমন পরীক্ষা দেবে? এই পরিস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে হবে।

ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা অবিলম্বে ভর্তি সহ বিভিন্ন দাবিতে ১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মহামিছিলে সামিল হবেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

সাতের পাতার পর

শরৎচন্দ্র, নজরুল এঁদের জীবনসংগ্রাম তুলে ধরুন। যাতে তারা জীবন প্রভাতে এক নতুন স্বপ্নের সন্ধান পায়। অন্তত কিছু ছেলেমেয়ে মানুষ হোক। তারা আমাদের দলে যুক্ত নাও হতে পারে। কিন্তু কিছু তো মনুষ্যত্ব থাকুক। সমাজে মানুষ তৈরি না হলে সেই সভ্যতার পরিণতি কী? সেই সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ফলে প্রত্যেককে আমি বলছি, আপনারা রবিবার দিন সকালবেলা এক ঘণ্টা সময় দিন, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার চেষ্টা করুন।

বিপ্লবী আদর্শই এস ইউ সি আই (সি)-র আসল শক্তি

অনেকে বলেন, আপনারা কি পারবেন? আপনাদের কি পাওয়ার আছে? পাওয়ার বলতে যদি বলেন এমএলএ, এমপি, মন্ত্রিত্ব— আমাদের সেই পাওয়ার নেই। আর সেই পথেও আমরা নেই। এমএলএ-এমপি মন্ত্রিত্বের পিছনে আমরা ছুটি না। ভোটে দাঁড়াই। এমএলএ-এমপি হলে বিধানসভায়, সংসদে আমরা গরিব মানুষের হয়ে লড়াই করি, প্রতিবাদ করি। আমাদের দল বিপ্লবী। আমরা সমাজের আমূল পরিবর্তন চাই। শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ চাই। ফলে আমাদের পাওয়ার আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শ, উন্নত নৈতিকতা। কোন পাওয়ারের জোরে বুদ্ধ লড়েছিলেন, মহাবীর লড়েছিলেন, শংকরাচার্য, যিশুখ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ লড়েছিলেন, নবজাগরণের মনীষীরা লড়েছিলেন, বিদ্যাসাগর লড়েছিলেন? তাঁরা কি এমএলএ-এমপির জোরে, মন্ত্রিত্বের জোরে লড়েছিলেন, নাকি লড়েছিলেন আদর্শের জোরে, উন্নত নৈতিক বলের জোরে? সেই শক্তি আমাদের আছে।

আপনারা আমাদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করুন। আপনাদের পাড়ায় পাড়ায় এলাকায় এলাকায় যে কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন। কমিটি গড়ে তুলুন, জনগণের কমিটি করুন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন। যেখানে নারীর উপর অত্যাচার দেখবেন রুখতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। যেখানে সরকারি অন্যায় দেখবেন, তার প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আর আমাদের বক্তব্য যদি সঠিক হয়, সেই বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যান। আপনাদের ঘরের সন্তানদের আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত করুন। এই সন্তানরা হয়তো বড় চাকরি করবে না, প্রচুর টাকা পয়সা রোজগার করবে না। কিন্তু পিতা-মাতা হিসাবে গর্ববোধ করতে পারবেন ছেলে মানুষ হয়েছে, মেয়ে মানুষ হয়েছে এই ভেবে। এই সাহস, এই মন নিয়ে আপনারা আপনাদের সন্তানদের আমাদের দলের পতাকাতলে এগিয়ে দিন। এটাও আপনাদের কাছে আমার আবেদন। আমি অনেকক্ষণ আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য রেখেছি। আমরা আপনাদের সমর্থন পাচ্ছি। আরও সক্রিয় সমর্থন চাই। বহুদূর থেকে আপনারা এসেছেন। পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলা থেকেই আপনারা এসেছেন বৃষ্টি মাথায় করে। আমি আর বেশি সময় নেব না। এখানেই শেষ করলাম।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ
সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম

৫ আগস্ট শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে রাজ্যে রাজ্যে সভার খবর গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এ বারও কয়েকটি রাজ্যের খবর প্রকাশ করা হল। উপরের প্রথম ছবিতে আসামের সভায় বক্তব্য রাখছেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় ছবিতে ওড়িশার সভায় বক্তব্য রাখছেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। নিচের ছবি ঃ ঝাড়খণ্ডের সভায় বক্তব্য রাখছেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী।

আসাম

ওড়িশা

ঝাড়খণ্ড

পরিকল্পনা করে সাংবাদিকদের হত্যা ইজরায়েলের

তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১২ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, গাজার আল-শিফা হাসপাতালের কাছে ইজরায়েলি বাহিনী যে ভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে সাত জন খ্যাতনামা সাংবাদিককে হত্যা করেছে তার নিন্দায় কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর এ এক ঘৃণ্য আক্রমণ। সারা দুনিয়ার সামনে এই সাংবাদিকরাই গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলের দুষ্কর্ম ও ধ্বংসলীলাকে ফাঁস করে দিয়েছেন। গাজায় সামরিক আক্রমণ শুরু করার পর থেকে ইজরায়েল অন্তত ২৭০ জন সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের কর্মীকে হত্যা করেছে। আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষত জেনেভা কনভেনশন ও তার প্রোটোকল এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদের মধ্যে কর্মরত সাংবাদিকদের যে রক্ষাকবচ দিয়েছে, তাঁদেরকে সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা আছে ইজরায়েল তা সম্পূর্ণ ভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে।

ইহুদিবাদী ইজরায়েলি শাসকরা গাজা ভূখণ্ডে নৃশংস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় যে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে তার সাথে একমাত্র হিরোসিমা-নাগাসাকিতে মার্কিন পরমাণু বোমা বর্ষণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিদের দ্বারা ইহুদি নিধন যজ্ঞে ভয়াবহ গণহত্যারই তুলনা চলতে পারে।

চাকরিহারা শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ

চাকরিহারা যোগ্য-শিক্ষক সুবল সরেনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। ১৬ আগস্ট তিনি এক বিবৃতিতে বলেন,

রাজ্য সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি এবং বিচারব্যবস্থার অমানবিক রায়ের পরিণতিতেই আরও একজন যোগ্য শিক্ষকের প্রাণ গেল। পশ্চিম মেদিনীপুরের শিক্ষক সুবল সরেন গত কয়েক মাস ধরে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। চাকরি পাওয়ার পর সাত বছর স্কুলে সম্মানের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন। সরকারের অপদার্থতার কারণে এত বছর বাদে তাঁর চাকরি চলে গেছে। পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে— এটা তিনি কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। যার পরিণতিতে কয়েক দিন আগেই তাঁর ব্রেন স্ট্রোক হয়। কলকাতাতে চিকিৎসার জন্য আনা হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। অন্য দিকে রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসন পরিবারের সদস্যদের না জানিয়ে দেহ লোপাট করার জন্য তড়িঘড়ি হাসপাতাল থেকে বের করে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমরা কলকাতা পুলিশের এ হেন আচরণে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। শুধু তাই নয়, মৃতদেহ পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরাতে পৌঁছলে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। আমরা পুলিশ ও প্রশাসনের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছি।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com